নবী (সা.) এর ছলাত সম্পাদনের পদ্ধতি

বিভাগ/অধ্যায়ঃ কিতাবটির সংকলন পদ্ধতি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দিন আলবানী (রহ.)

কিছু সংশয় ও তার উত্তর - দ্বিতীয় সংশয়

দ্বিতীয় সংশয়ঃ যখন দীনের ব্যাপারে মতভেদ নিষিদ্ধ হল। তবে ছাহাবা ও তাদের পরবর্তী ইমামগণের মতভেদ সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কী? আর তাদের মতবিরোধ ও পরবর্তীদের মতপার্থক্যের মধ্যে কি কোন তফাৎ রয়েছে?

উত্তরঃ হ্যা, উভয় মতানৈক্যের মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে যা দুটি বিষয়ের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় ।

এক- মত পার্থক্যের কারণ।

দুই- তার প্রতিক্রিয়া।

ছাহাবাদের মধ্যকার মতভেদ ছিল অনিবার্য কারণ সাপেক্ষে, যা তাদের বুঝের বেলায় স্বভাবগতভাবেই সংঘটিত হয়েছিল, ইচ্ছাকৃতভাবে নয়। এর সাথে আরো কিছু বিষয় যোগ হবে যা তাদের যুগে মতবিরোধকে অপরিহার্য করেছিল যা তৎপরবর্তীকালে দূর হয়ে যায়।[1] আর এটি এমন মতানৈক্য যা থেকে সম্পূর্ণ উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। উপরোক্ত আয়াত বা তার সমার্থবোধক আয়াতসমূহের নিন্দাও তাদেরকে স্পর্শ করবে না! কেননা এক্ষেত্রে জবাবদিহিতার শর্ত বিদ্যমান নেই। আর তা হচ্ছে ইচ্ছা বা পীড়াপীড়ি করে অটল থাকা।

কিন্তু বর্তমান যুগের অন্ধ অনুসরণকারীদের (মুক্বাল্লিদদের) মধ্যকার মতভেদ এমন পর্যায়ের যাতে সাধারণত কোন উযর নেই। কেননা তাদের কারো নিকট কখনো কুরআন হাদীছের এমন দলীল প্রকাশিত হয় যা সাধারণত তিনি যে মাযহাবের অনুসরণ করেন না তার সমর্থন করে তখন তিনি শুধু এজন্যই তা পরিত্যাগ করেন যে এটি তার মাযহাবের বিপরীত- আর অন্য কোন কারণে নয়। যার পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, মাযহাবটাই তার কাছে যেন আসল অথবা এটাই সেই দ্বীন যা নিয়ে মুহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আগমন করেছেন, আর অন্য মাযহাব হচ্ছে ভিন্ন আরেক ধর্ম যা রহিত হয়ে গেছে।

অপর আরেক দল এদের বিপরীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। তারা এই বিস্তর মতানৈক্যপূর্ণ মাযহাবগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন শরীয়ত মনে করেন যেমন স্পষ্ট ভাষায় তাঁদের পরবর্তদের কেউ কেউ একথা বলেছেনঃ[2]

لاحرج على المسلم أن يأخذ من أيها ما شاء ويدع ماشاء، إذ الكل شرع

অর্থঃ মুসলিম ব্যক্তির বেলায় কোন আপত্তি নেই। এ সব মাযহাব থেকে যেটা ইচ্ছে গ্রহণের ও যেটা ইচ্ছে বর্জনের যেহেতু এগুলোর প্রত্যেকটি (স্বতন্ত্র) শরীয়ত।

আর উভয় প্রকারের লোকজনই কখনও কখনও সেই বাত্বিল হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করে থাকে (اختلاف أمتي رحمة) আমার উম্মতের মতভেদ রাহমাত । তাদেরকেও উক্ত হাদীছ দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে দলীল গ্রহণ করতে শুনেছি। তাদের কেউ আবার এই হাদীছের কারণও দর্শায় এই বলে যে, মতভেদটা এজন্যই রাহমাত যে, এতে

জাতির উপর উদারতা প্রদর্শন করা হয়।

এই ব্যাখ্যাটি পূর্বোক্ত আয়াতসমূহের স্পষ্ট বিরোধী ও ইমামগণের পূর্বোল্লিখিত বক্তব্য সমূহের মর্মবিরোধী হওয়া ছাড়াও তাদের কারো কারো স্পষ্ট প্রতিবাদও এর বিরুদ্ধে এসেছে।

ইবনুল কাসিম বলেনঃ আমি মালিক এবং লাইছকে বলতে শুনেছি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছাহাবাদের মতবিরোধ সম্পর্কে লোকজন যে রকম বলে যে, এতে উদারতা রয়েছে তা সঠিক নয়। বরং তা হচ্ছে ভুল শুদ্ধের ব্যাপার মাত্র।[3]

আশাহাব বলেনঃ ইমাম মালিককে জিজ্ঞাসা করা হল ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিশ্বস্ত কোন ছাহাবীর বর্ণনাকৃত হাদীছের কোন একটি হাদীছ অবলম্বন করল- আপনি কি তাকে এ ব্যাপারে স্বাধীন মনে করেন?

তিনি বললেনঃ আল্লাহর শপথ, না, যতক্ষণ হাক পর্যন্ত না পৌঁছে, হকতো একটাই, বিপরীতমুখী দু'টি কথাকি একই সাথে সঠিক হয়? সত্য ও সঠিকতো একটাই হয়।[4]

ইমাম শাফি'ঈর সাথী মুযানী বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছাহাবাগণ মতবিরোধ করেছেন, তাদের একজন অপরজনের ভুল ধরেছেন এবং তাদের একজন অপরজনের মতামত বিবেচনা করে দেখেছেন এবং তার উপর মন্তব্য করেছেন। যদি তাদের সব কয়টি কথা সঠিকই হত তাদের কাছে, তবে তাঁরা এমনটি করতেন না। আর উমর ইবনুল খাত্তাব, উবাই ইবনু কা'ব এবং ইবনু মাসউদ এর মতানৈক্যের উপর রাগান্বিত হন তারা যখন একটিমাত্র কাপড় পরিধান করে ছলাত (বিশুদ্ধ হওয়া না হওয়ার) ব্যাপারে উভয়ে মতবিরোধ করছিলেন যখন উবাই বললেনঃ একটি কাপড়ে ছলাত আদায় করা সুন্দর ও চমৎকার কাজ। আর ইবনু মাসউদ বললেন, এটা তো কেবল ঐ সময়কার কথা যখন কাপড় কম ছিল। তখন উমর রাগান্বিত হয়ে তাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এমন দু'জন ছাহাবী মতভেদ করছেন যাদের অনুকরণ করা হয় এবং যাদের কথা গ্রহণীয়। তবে উবাই সঠিক বলেছেন। আর ইবনু মাসউদ চেষ্টায় ত্রুটি করেননি। কিন্তু আমার আজকের এই বক্তব্য শুনার পর যে কাউকে এ বিষয়ে মতভেদ করতে শুনব তাকেই এই এই (শাস্তি প্রদান) করব।[5]

ইমাম মুযানি আরো বলেনঃ যে ব্যক্তি মতভেদকে জায়েয রাখে এবং এই ধারণা পোষণ করে যে, কোন বিষয়ে যদি দু'জন আলিম মতবিরোধ করেন এবং একজন বলেনঃ এটা হালাল আর অপরজন বলেনঃ এটা হারাম, তবে তাদের উভয়জনই তাদের গবেষণায় হকের উপর আছেন, তাকে জিজ্ঞেস করা হবে তুমি এ কথা দলীল ভিত্তিক বলেছে, নাকি কিয়াস (অনুমান) ভিত্তিক? যদি বলেঃ দলীল ভিত্তিক, তবে তাকে বলা হবে কিভাবে দলীল ভিত্তিক হয়। অথচ কুরআন (এর বিপক্ষে) মতানৈক্যকে নিষেধ করছে তুমি কিভাবে সেখানে তার বৈধতার উপর কিয়াস করছ। এটা কোন আলিমতো দূরের কথা কোন বিবেকবান ব্যক্তি বৈধ বলতে পারে না।[6]

যদি কেউ বলেঃ আপনি ইমাম মালিক থেকে যা উল্লেখ করলেন যে হক একটাই হয় একাধিক হয় না, তাতো উস্তায যারাক্বা তার "আলমাদখালুল ফিকহী" গ্রন্থের (১/৮৯) তে যা লিখেছেন তার বিপরীত হয়ে যাচ্ছেঃ আবু জা'ফর আল মানছুর এবং তাঁর পরে রাশীদ মনস্থ করেন যে, ইমাম মালিক এর মাযহাব ও তাঁর কিতাব "আল-মুয়াত্তা" কে আব্বাসীয় রাষ্ট্রের বিচার বিভাগের সংবিধান হিসাবে পরিগণিত করবেন তাতে মালিক উভয়কে বাধা দেন এবং বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছাহাবাগণ (ফিকহের) অমৌলিক বিষয়ে মতভেদ

করেছেন এবং দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েন। আর তাদের প্রত্যেকেই সঠিক।

আমি বলছিঃ এ ঘটনাটি ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ, কিন্তু শেষের কথাটি “প্রত্যেকেই সঠিক” তার কোন ভিত্তি আমি জানতে পারিনি- ঐ সকল বর্ণনা ও গ্রন্থাদির মাধ্যমে আমি যেগুলো ওয়াকেফহাল হয়েছি।[7] তবে আবু নুআইম “আল হিলইয়াহ্” গ্রন্থের (৬/৩৩২ পৃঃ) তে একটি মাত্র বর্ণনা নিয়ে এসেছেন যাতে মিক্‌দাম ইবনু দাউদ রয়েছে, একে যাহাবী দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাছাড়া এর শব্দ হচ্ছেঃ (وكل عند نفسه مصيب) অর্থঃ প্রত্যেকেই নিজের বিচারে সঠিক।

তার কথা (عند نفسه) প্রমাণ বহন করে যে, “আলমাদখাল” এর বর্ণনা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। এমনটি কেনই বা হবে না যেখানে এটা ইমাম মালিক থেকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার বিরোধিতা করছে যা হচ্ছে এই যে, হক এক, তা একাধিক হয় না। যেমন এর আলোচনা অতিবাহিত হয়ে গেল। এর উপরে ছাহাবা তাবিঈন এবং মুজতাহিদ ইমাম চতুষ্টয় ও অন্যান্য ইমামগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইমাম ইবনু আব্দিল বর বলেনঃ (২/৮৮ পৃঃ) সংঘাতপূর্ণ দুই পক্ষের উভয় বক্তব্যই যদি সঠিক হত তবে সালাফদের একজন অপরজনের গবেষণা, বিচার এবং ফতওয়াতে ভুল ধরতেন না। বিবেকও একথা অস্বীকার করে যে, কোন বস্তু আর তার বিপরীতমুখী বস্তু উভয়টাই সঠিক হবে। কি সুন্দরইনা বলেছেন যিনি এ কবিতা আবৃত্তি করেছেন-

إثبات ضدين معا في حال ـ أقبح ما يأتي من المحال

অর্থঃ দু'টি বিপরীতমুখী বস্তুকে একই অবস্থায় এক সাথে সাব্যস্ত করা ঘৃণ্যতম অসম্ভব।

যদি বলা হয়ঃ এই বর্ণনা যদি ইমাম থেকে ভুল সাব্যস্তই হয়, তবে মানছুর যখন মানুষকে তাঁর কিতাব “আল মুয়াত্তা” এর উপর ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন তখন তিনি কেন তা গ্রহণ না করে অস্বীকৃতি জানান?

আমি বলছিঃ সর্বাধিক সুন্দরতম যে বর্ণনা সম্পর্কে আমি অবহিত হয়েছি তা হচ্ছে ঐটি যেটি হাফিয ইবনু কাছীর তার “শারহ ইখতিছারি উলুমিল হাদীছ” গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম মালিক বলেনঃ লোকজন এমন সব বিষয় একত্রিত করেছে ও জেনেছে যা আমি (হয়ত) জানতে পারিনি। একথা তাঁর (ইমাম মালিকের) জ্ঞান ও ইনছাফের পূর্ণতার প্রমাণ— যেমন ইবনু কাছীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন।

সুতরাং সাব্যস্ত হল যে, সব মতভেদই মন্দ এবং তা রাহমাত নয়। তবে কোন কোন মতভেদ এমন রয়েছে যার উপর মানুষকে পাকড়াও করা হবে যেমন গোড়া মাযহাব পন্থীদের মতভেদ। আর কোনটি এমন যে, তার উপর পাকড়াও করা হবে না। যেমন ছাহাবাহ এবং তাঁদের অনুসারী ইমামগণের মতভেদ। আল্লাহ তাদের দলে আমাদের হাশর করুন এবং আমাদেরকে তাদের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। এখন প্রকাশ পেল যে, ছাহাবাগণের মতভেদ ছিল মুকুল্লিদদের মতভেদ থেকে আলাদা।

সারকথাঃ ছাহাবাগণ নিরুপায় অবস্থায় মতভেদ করেছেন। কিন্তু তারা মতভেদের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন এবং যতদূর সম্ভব এ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতেন। পক্ষান্তরে মুকুল্লিদগণ মতভেদপূর্ণ বিষয়ের বিরাট এক অংশে এই মতবিরোধ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও তারা একমত হয় না এবং এর জন্য চেষ্টাও করে না, বরং তারা একে সাব্যস্ত করে। তাই উভয় মতবিরোধের মধ্যে বিরাট দূরত্ব রয়েছে। এই পার্থক্য ছিল কারণের দিক থেকে।

আর প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে উভয় মতভেদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে আরো স্পষ্ট, আর তা এই যে, ছাহাবা

(রাযিয়াল্লাহু আনহুম) অমৌলিক বা খুঁটিনাটি বিষয়ে মতবিরোধ করা সত্ত্বেও— তাঁরা ঐক্যের ভাব মূর্তিকে কঠিনভাবে সংরক্ষণ করতেন। যে সব বিষয় ঐক্য বাণীর মধ্যে বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টি করে তা থেকে তারা সম্পূর্ণ বিরত থাকতেন। যেমন তাদের মধ্যে কেউ সশব্দে বিসমিল্লাহ বলার পক্ষে মত ব্যক্ত করতেন আবার কেউ এটি ঠিক মনে করতেন না। তাদের কেউ রাফউল ইয়াদাইন করা মুস্তাহাব মনে করতেন। আবার কেউ তা মনে করতেন না। এমনিভাবে কেউবা মহিলা স্পর্শ করলে উযু ভঙ্গ হওয়ার পক্ষে ছিলেন আবার অন্যরা ছিলেন এর বিপক্ষে। তা সত্ত্বেও তারা সবাই এক ইমামের পিছনে ছলাত পড়তেন এবং মাযহাবী মতানৈক্যকে কেন্দ্র করে তাদের কেউ ইমামের সাথে ছলাত পড়া থেকে বিরত থাকেননি। পক্ষান্তরে মুকাল্লিদগণের অন্ধ অনুসারীগণের মতবিরোধ হচ্ছে সম্পূর্ণ এর বিপরীত। যার পরিণতি এই দাঁড়িয়েছে যে, মুসলিমগণ দুই সাক্ষ্যবাণী তথা আল্লাহ ও রসূলের সাক্ষ্য প্রদানের পর পরই সর্বপ্রধান ভিত্তি ছলাতের ব্যাপারে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তারা সবাই একত্রে এক ইমামের পিছনে ছলাত পড়তে অস্বীকৃতি জানায় এই বলে যে, ভিন্ন মাযহাবের ইমামের ছলাত বাত্বিল আর না হয় অন্ততপক্ষে মাকরুহ। আমরা একথা শুনেছি এবং দেখেছি। যেমন অন্যরাও দেখেছে।[৪]

কেনইবা তা হবে না যেখানে আজকের দিনে প্রসিদ্ধ কিছু মাযহাবের কিতাবে স্পষ্টাক্ষরে ছলাত মাকরুহ বা বাতিল হওয়ার কথা বিদ্যমান রয়েছে! যার পরিণতি হিসাবে আপনি কোন কোন দেশে একই জামে মসজিদে চারটা মেহরাব দেখতে পাবেন যাতে পার পর চারজন ইমাম সালাত পড়ান। লোকজনকে দেখতে পাবেন তাদের ইমামের জন্য অপেক্ষা করছে অথচ অপর আরেকজন ইমাম দাড়িয়ে ছলাত পড়ছেন। বরং কিছু মুকাল্লিদদের নিকট মতানৈক্য এই পর্যন্ত গড়িয়ে গেছে যে, তারা হানাফী বর এবং শাফিঈ কন্যার মধ্যে বিয়ে নিষেধ করেছে। পরবর্তীতে হানাফীদের নিকট প্রসিদ্ধ এক লোক যাকে “মুফতী আস-সাকলাইন” জ্বিন ইনসান উভয় জাতির মুফতী উপাধিতে ভূষিত করা হয়, তিনি পুরুষের সাথে শাফিঈ কন্যার বিবাহ বৈধ বলে ঘোষণা দেন এই কারণ দর্শিয়ে যে, সেই মহিলাকে আহলুল কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টানদের) পর্যায়ভুক্ত ধরে নেয়া হবে।[৫] যার অর্থ এই যে, (আর তাদের নিকট কিতাবাদির অর্থই গ্রহণযোগ্য)-এর বিপরীত বৈধ নয় অর্থাৎ শাফিঈ বরের সাথে হানাফী কন্যার বিয়ে বৈধ নয়। যেমন কিতাবী (ইহুদী-খৃষ্টান) বরের সাথে মুসলিম কন্যার বিবাহ বৈধ নয়। অনেক দৃষ্টান্ত থেকে এ দু’টি দৃষ্টান্ত পেশ করা গেল যা জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য ঐ অশুভ পরিণতির কথা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরছে যা পরবর্তীদের মতবিরোধ এবং এর উপর জড়বদ্ধ থাকার ফলশ্রুতিতে ঘটেছে। এটা পূর্বসুরীদের মতভেদের চেয়ে ভিন্ন। কেননা তাদের মতপার্থক্যের কোন অশুভ পরিণতি জাতির উপর পতিত হয়নি। এজন্যই তারা দ্বীনের মধ্যে বিভেদ সষ্টির উপর নিষেধাজ্ঞা বহনকারী আয়াতগুলোর আওতার বাহিরে। কিন্তু পরবর্তীদের কথা এর চেয়ে ভিন্ন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর সঠিক পথের সন্ধান দিন। হায় যদি তাদের উল্লেখিত মতভেদের ক্ষতি তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত এবং তা অমুসলিম জাতিদের পর্যন্ত না গড়াতো! তবে বিপদ কিছুটা হলেও হালকা হত, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে তা তাদেরকে ছাড়িয়ে অন্যদের পর্যন্ত তথা বিভিন্ন দেশ ও রাষ্ট্রের কাফিরদের পর্যন্ত অতিক্রম করেছে এবং তাদের অনৈক্য দ্বারা এদেরকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখছে। উস্তায মুহাম্মদ আল গাযালী “যলামুন মিনাল গারব” কিতাবের ২০০ পৃষ্ঠায় বলেন, আমেরিকার ব্রেন্সটন ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে এক আলোচক একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন যেটি প্রায়ই প্রাচ্যবিদ এবং ইসলামী বিষয়াদি সম্পর্কে গুরুত্বদানকারী ব্যক্তিদের মাঝে আওড়ানো হচ্ছে, তিনি বলেন মুসলিমগণ কোন শিক্ষা নিয়ে বিশ্বের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তাদের উচিত হবে- যে ইসলামের দিকে তারা আহবান করছে তা নির্ণয় করা। তারা কি সুন্নীদের বুঝ সাপেক্ষ ইসলামী শিক্ষা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে নাকি শিয়াহ তথা ইমামবাদী বা যায়দীয়াহদের বুঝ সাপেক্ষ ইসলামী শিক্ষা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে? এরপরে এরা ও তারা (শিয়াহ সুন্নীর) প্রত্যেকেই আপোসে

মতানৈক্যে ভুগছে। কোন সময় তাদের এক দল প্রশ্ন বিষয়ে সীমাবদ্ধ প্রগতির চিন্তা করলে অপরদল পুরনো সংকীর্ণতামূলক চিন্তা

করে।

সার কথা এই যে, ইসলামের প্রতি দাওয়াতদানকারীগণ দাওয়াতকৃত ব্যক্তিদেরকে অস্থিরতার ভিতরে ফেলে দেয়। কারণ তারা নিজেরাই অস্থিরতায় ভূগছে।[10]

আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান আল মাছুমীর “হা-দীয়াতুস সুলতান ইলা মুসলিমী বিলাদি জাবান” পুস্তিকার ভূমিকায়

রয়েছেঃ আমার কাছে জাপান দেশের মুসলিমদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন এসেছে তারা হচ্ছে প্রাচ্যের শেষ প্রান্তে অবস্থিত “টোকিও” ও “ওসাকা” নগরীর লোক, যার সার কথা হচ্ছেঃ ইসলাম ধর্মের হাকীকত (বাস্তবরূপ) কী? অতঃপর মাযহাব অর্থ কী? যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবে তার উপর কি চার মাযহাবের যে কোন একটি গ্রহণ করা অপরিহার্য? অর্থাৎ তাকে কি মালিকী, হানাফী, শাফি’ঈ অথবা অন্য কোন মাজহাব অবলম্বী হতে হবে, নাকি না হলেও চলবে?

কারণ এখানে বিরাট মতানৈক্য ঘটেছে এবং ভয়ানক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। যখন জাপানের স্বচ্ছ চিন্তা ধারার কিছু লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে এবং ঈমানের মর্যাদায় মর্যাদাবান হতে ইচ্ছা পোষণ করে। যখন তারা “টোকিও”তে বিদ্যমান মুসলমানদের সংগঠনগুলোর কাছে তাদের মুসলিম হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে তখন ভারতবর্ষের একদল বললঃ তাদের উচিত ইমাম আবু হানীফার মাযহাব অবলম্বন করা কেননা তিনি জাতির চেরাগ বা আলোকবর্তিকা। আবার ইন্দোনেশিয়ার “জাওয়া” এর একদল বললঃ (না তাদের) শাফি’ঈ হওয়া আবশ্যক। জাপানী লোকেরা তাদের কথা শুনে অতিশয় আশ্চর্যবোধ করলেন এবং তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পড়লেন। এভাবে মাযহাবের বিষয়টাই তাদের ইসলাম গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল।

ফুটনোট

[1] দেখুন ইবনু হাযম এর "আল-ইহকাম কী উছলিল আহকাম" এবং দেহলভীর “হুজ্জাতুল বালেগা” অথবা এবিষয়ের উপর লিখা তাঁর পুস্তিকা “ইকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদি অত্তাকলীদ”।

[2] দেখুন মানাবীর “ফয়যুল কাদীর” (১/২০৯) অথবা “সিলসিলাতুল আহাদীস আয-যাঈফাহ অল-মাওযূ’আহ” (১/৭৬,৭৭)

[3] ইবনু আব্দিল বার এর “জা-মিউ বায়ানিল ইলম” (২/৮২, ৮৮, ৮৯)।

[4] প্রাগুক্ত, (২/৮৩, ৮4)।

[5] প্রাগুক্ত, (২/৮৯)

[6] প্রাগুক্ত।

[7] ইবনু আব্দিল বার 'আল-ইনতিকা' (৪১) ও হাফিয ইবনু আসাকির এর "কাশফুল মুগত্বা-ফী-ফাযলিল মুওয়াত্তা" (৬-৭ পৃঃ) ও যাহাবীর "তাযকিরাতু হুফফায" (১/১৯৫ পৃঃ)।

[8] দেখুন মা-লা-ইয়াজুয ফীহিল খিলাফ কিতাবের অষ্টম পরিচ্ছেদ (৬৫-৭২, পৃঃ) তাতে অনেক দৃষ্টান্ত পাবেন যে বিষয়ের প্রতি আমি ইঙ্গিত করেছি। যার কিছু আযহার (বিশ্ববিদ্যালয়)-এর আলিমদের দ্বারাও ঘটেছে।

[9] আল-বাহরুর রা'ইক।

[10] আমি বলবঃ গাযালীর শেষ দিনগুলোর অনেক লিখনী যেমন তার শেষের দিনগুলোতে প্রকাশিত কিতাব যার নাম "আস-সুন্নাতুন নববিয়্যাহ বাইনা আহলিল ফিকহি ওয়া আহলুল হাদীস" কথা প্রমাণ করেছে যে, তিনি নিজেই হচ্ছেন এমন দায়ীদের অন্তর্ভুক্ত যারা নিজেরাই অস্থিরতায় ভুগছেন। আমরা তাঁর এই অবস্থা পূর্ব থেকেই অনুভব করতাম- তার কিছু কথা ও তাঁর সাথে আমাদের কিছু ফিকহী বিষয়ে বিতর্ক এবং তার কোন কোন গ্রন্থরাজির কথা ও লিখনী থেকে যার মাধ্যমে তার এই অস্থিরতা ও সুন্নাহ থেকে পথভ্রষ্টতা এবং হাদীছের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়ে স্বীয় বিবেককে মাপকাঠি বানানোর প্রবণতা প্রকাশ পায়। তিনি এ ক্ষেত্রে হাদীছ শাস্ত্রের এবং তার উছুল (ব্যাকরণ) এর ধার ধারেন না। আর না তিনি এ বিষয়ে বিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হন। বরং যা তার কাছে ভাল লাগে তাই বিশুদ্ধ যদিও তা যাঈফ হয়। আর যা তার কাছে ভাল লাগে। না সবার কাছে বিশুদ্ধ হলেও তার নিকট সেটা যঈফ হয়ে যায়। যেমন আপনি তা প্রকাশ্যেই দেখতে পাবেন আমার ভূমিকার উপর তাঁর মন্তব্যের মধ্যে, যে ভূমিকাটি আমি তার কিতাব "ফিকহুস সিরাহ" এর উপর আমার হাদীছের হাওয়ালা লিখার শুরুতে সংযুক্ত করেছিলাম যা চতুর্থ সংস্করণে ছাপানো হয়। এই কাজটি মূলত কোন আযহারী ভাই মারফত তার পক্ষ থেকে প্রস্তাব ভিত্তিক ছিল। আমি সেদিন দ্রুত এই কাজে হাত দিয়েছিলাম। এই মনে করে যে, এটা তাঁর পক্ষ থেকে সুন্নাহ ও নবী চরিত বিষয়ে গুরুত্ব প্রদর্শন হবে এবং একে বহিরাগত বস্তুর অনুপ্রবেশ থেকে সংরক্ষিত রাখার আগ্রহই তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এমনকি তিনি আমার হাওয়ালাকে প্রচার করেন এবং ইঙ্গিতকৃত মন্তব্যে তাঁর আনন্দের কথা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেন। তার মন্তব্যের হেডিং হচ্ছে (حول أحاديث هذا الكتاب) এতদসত্ত্বেও তাতে তাঁর যঈফ হাদীছ গ্রহণের পদ্ধতি এবং কেবল বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করে বিশুদ্ধ হাদীছ পরিত্যাগ করার কথা আলোচনা করেন। তিনি এদ্বারা একথাই বুঝাতে চান যে, আমার জ্ঞান নির্ভর হাওয়ালা সংকলনের মত কাজের কোনই মূল্য তার কাছে নেই। যেহেতু তা এখন দৃষ্টিভঙ্গি খাটানোর স্থানে যা একজন থেকে অপরজনের কাছে যথেষ্ট ভিন্ন রকম হয়ে। তাই যেটা এই ব্যক্তির কাছে গ্রহণীয় হবে সেটিই অপরজনের কাছে হবে বর্জনীয় এমনিভাবে এর বিপরীতের সাথে বিপরীত। এতে করে দীন অনুকরণীয় প্রবৃত্তিতে পরিণত হবে যেখানে ব্যক্তি বিশেষের চিন্তা ছাড়া- কোন নিয়ম-নীতি থাকবে না। যা সব মুসলিম মনীষীদের পরিপন্থী। তারা জানেন যে, সূত্র (সনদ) দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত যদি সূত্র না থাকত তবে যে যা ইচ্ছা করত তাই বলত। কিন্তু গাযালী উপরোক্ত কাজ করেছে (আল্লাহ একে হিদায়াত করুন) তার "সীরাহ" গ্রন্থের অনেক হাদীছের ব্যাপারে। তাঁর কিতাবের বড় এক অংশ মুরসাল এবং মু'যাল হাদীছ দ্বারা ভরপুর। সেই সাথে এর যেগুলোতে সম্বন্ধ রয়েছে তাঁর মধ্যেও কিছু দুর্বল সূত্র রয়েছে যা শুদ্ধ নয়। যে কথা আমার হাওয়ালা সংকলনে দৃষ্টি নিক্ষেপকারী প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে সুষ্ঠুরূপে প্রতিভাত। এতদসত্ত্বেও উপরোক্ত শিরোনামে সানন্দে বলেছেনঃ আমি সঠিক পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা করেছি, আর সম্মানিত গ্রন্থরাজির উপর নির্ভর রেখেছি। আমি আমাকে এই ক্ষেত্রে সুন্দর এক অবস্থানে পৌছাতে পেরেছি বলে

মনে করি, এতো হাদীছ জমা করেছি যাতে একজন সচেতন আলিমের অন্তর শান্ত হয়ে যাবে।

তিনি এমনটিই বলেছেন। তবে তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় আপনার গবেষণায় আপনি কোন নীতির অনুসরণ করেছেন- তা কি হাদীছ শাস্ত্রের মৌলনীতি যা নাবী চরিত্রের বিশুদ্ধ হাদীছের পরিচয় পাওয়ার একক উপায়? তবে তার কাছে আপনি ব্যক্তিগত চিন্তার উপর ভরসা করার কথা ছাড়া আর কোন উত্তর থাকবে না। যার মধ্যেকার ক্ষতি উল্লেখিত ইঙ্গিতে রয়েছে। একথার প্রমাণ হচ্ছে অশুদ্ধ সূত্রের হাদীছকে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ সূত্রের হাদীছকে দুর্বল বলে দেয়া যদিও তা বুখারী-মুসলিমের হাদীছও হয়। যেমন একটু পূর্বে ইঙ্গিতকৃত আমার ভূমিকায় তা বর্ণনা করেছি যা তিনি স্বীয় কিতাব “ফিকহুস সীরাহ” এর শুরুতে ছাপিয়েছিলেন (চতুর্থ সংস্করণ)। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, পরবর্তী মুদ্রণগুলোতে তা বাদ দিয়ে দেন। যেমন “দারুল আরাক্কাম” দামেস্ক ও অন্যান্য মুদ্রণ! তাঁর এই আচরণ কিছু লোককে এই ধারণা পোষণে বাধ্য করেছে যে, তাঁর পূর্বের আবেদন কেবল সাধারণ পাঠকদের মধ্যে তার কিতাবকে প্রসিদ্ধি দান করার উদ্দেশে ছিল যেসব পাঠক সুন্নাহর সেবক ও তাঁর প্রতিরক্ষক এবং হাদীছের মধ্যে শুদ্ধ অশুদ্ধ পার্থক্যকারীদের শ্রমকে মূল্যায়ন করে- যারা এ কাজ করে জ্ঞানপূর্ণ নিয়মনীতি অনুযায়ী, ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিভিন্ন প্রবৃত্তির তাড়নায় নয় যেমন করেছেন গাযালী (আল্লাহ তাকে হিদায়াত দিন) তাঁর এই এবং শেষ কিতাবে যা হচ্ছে- “আস-সুন্নাতুন নববিয়্যাহ বাইনা আহলিল ফিকহি ওয়া আহলুল হাদীস” তার এই আচরণ থেকে লোকজন পরিষ্কারভাবে জেনে গেছে যে, সে মুতাযিলী লোক। তার কাছে যুগ যুগ ধরে মুহাদ্দিছগণের হাদীছের সেবায় শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয়ে কঠোর সাধনার কোনই মূল্য নেই, ঠিক তদ্রুপ ফকীহ ইমামগণের সাধনারও কোন মূল্য নেই- যারা মূলনীতি নির্ধারণ করেন এবং এর উপর ভিত্তি করে শাখাগত বিষয়ে সমাধান বের করেন। কেননা তিনি এ থেকে যা ইচ্ছা গ্রহণ করেন এবং যা ইচ্ছা বর্জন করেন তাদের কোন মৌলনীতি বা নিয়ম-নীতির সাথে মিল ছাড়াই।

অনেক গুণী জ্ঞানী আলিম (আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন) তাঁর প্রতিবাদ করেছেন এবং তাঁর অস্থিরতা ও ভ্রান্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সর্বাধিক সুন্দর যে প্রতিবাদটি আমার চোখে পড়েছে তা আমার বন্ধু ডঃ রাবী' বিন হাদী আল-মাদখালীর আফগানী আল-মুজাহিদ পত্রিকা ছাপিয়েছে (৯-১১ সংখ্যা) এবং শ্রদ্ধেয় ভাই ছালিহ বিন আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মদ আ-লুশ শাইখ এর পুস্তিকা, যার নাম “আল-মি’ইয়ার লি-ইলমিল গাজালী”।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8104

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন